بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২২ অক্টোবর, ২০২১ মোতাবেক ২২ ইখা, ১৪০০ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

গত খুতবায় আমি হযরত উমর (রা.)-এর শাহাদাতের প্রেক্ষাপটে হযরত উবায়দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) এবং হযরত উসমান (রা.)-এর মধ্যকার পারস্পরিক বিতণ্ডার কথা উল্লেখ করেছিলাম। (সেই সাথে) এটিও বলেছিলাম যে, রেওয়ায়েতটি যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সে দৃষ্টিকোণ থেকে তা কতটুকু সত্য তা আল্লাহ্ই ভালো জানেন। অর্থাৎ তাদের পরস্পরের মাঝে লড়াই হয়েছিল (মর্মে কথাটির সত্যাসত্য জানা নেই)। এ সম্পর্কে আরো অনুসন্ধানের পর যে বিষয়গুলো সামনে এসেছে তা-ও বলে দিচ্ছি। একস্থানে একথারও উল্লেখ পাওয়া গেছে যে, হযরত উবায়দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) যখন হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে বিতণ্ডায় লিপ্ত হন তখনও হযরত উসমান (রা.) খিলাফতের আসনে সমাসীন হন নি। আগেই বলা হয়েছে, উবায়দুল্লাহ্র সংকল্প ছিল যে, তিনি (আজ) মদিনার কোন বন্দিকেই আর জীবিত রাখবেন না। প্রাথমিক মুহাজেররা তার বিরুদ্ধে একত্র হয়ে তাকে বাধা দেন এবং তাকে ধমক দেন। কিন্তু তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি অবশ্যই তাদেরকে হত্যা করব, অর্থাৎ যত কয়েদি ও দাস রয়েছে (তাদেরকে হত্যা করব) আর মুহাজেরদেরও তিনি পাত্তা দেন নি। এমনকি হযরত আমর বিন আস (রা.) তার সাথে অনবরত আলোচনা করতে থাকেন আর অবশেষে তিনি হযরত আমর বিন আস (রা.)-এর হাতে তরবারি তুলে দেন। এরপর সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) তাকে বুঝানোর জন্য তার কাছে আসেন, তখন তার সাথেও হযরত উবায়দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) ঝগড়া করেন। যেভাবে বলা হয়েছে যে, হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে বাগ্বিতণ্ডা হয় আর লোকজনও আপোশ করানোর চেষ্টা করে। আরও উল্লেখ পাওয়া যায় যে, যখন এই ঘটনাটি সংঘটিত হয় তখনও হযরত উসমান (রা.)-এর হাতে বয়আত করা হয় নি। অর্থাৎ হযরত উসমান (রা.) তখনও খলীফা মনোনীত হন নি, যেভাবে ইতিপূর্বেও বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে এ ইঙ্গিতও পাওয়া যায় যে, হযরত উবায়দুল্লাহ্ (রা.)-কে এরপর গ্রেফতারও করা হয়েছিল। হযরত উসমান (রা.)-এর হাতে বয়আতের পর, অর্থাৎ খলীফার আসনে সমাসীন হওয়ার পর হযরত উবায়দুল্লাহ্ (রা.)-কে হযরত উসমান (রা.)-এর সামনে পেশ করা হয়। তখন আমীরুল মু'মিনীন মুহাজের ও আনসারদের একটি দলকে সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করেন, আপনারা আমাকে এই ব্যক্তি সম্পর্কে মতামত দিন, যে ইসলামের (শিক্ষা বাস্তবায়নে) পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। তখন হযরত আলী বিন আবি তালেব (রা.) বলেন, তাকে ছেড়ে দেয়া ন্যায়পরিপন্থি কাজ হবে, আমার মতে তাকে অর্থাৎ উবায়দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.)-কে মৃত্যুদণ্ড দেয়া উচিত। কিন্তু কোন কোন মুহাজের এই রায়কে অসহনীয় কঠোরতা ও কড়া শাস্তি আখ্যা দেন এবং বলেন, গতকাল উমর (রা.)-কে হত্যা করা হয়েছে আর আজ তার পুত্রকে হত্যা করা হবে? এই আপত্তি উপস্থিত লোকদের দুঃখভারাক্রান্ত করে আর হযরত আলী (রা.)ও নীরব থাকেন। কিন্তু যাহোক, হযরত উসমান (রা.) চাইলেন যেন উপস্থিত লোকদের মধ্যে থেকে কেউ এই স্পর্শকাতর অবস্থা উত্তরণের জন্য কোন পথ খুঁজে বের করেন বা পরামর্শ দেন। সেই বৈঠকে হযরত আমর বিন আস (রা.) উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ আপনাকে এর ঊর্ধ্বে রেখেছেন। (কেননা) এটি তখনকার ঘটনা যখন

আপনি মুসলমানদের আমীর ছিলেন না আর এ ঘটনা যেহেতু আপনার খিলাফতকালে সংঘটিত হয় নি, তাই আপনার ওপর এর কোন দায়ভারও বর্তায় না। কিন্তু হযরত উসমান (রা.) তার এই রায়ে আশ্বস্ত হতে পারেন নি, বরং তিনি (রা.) রক্তপণ দেয়াকেই সঠিক মনে করেন। তাই তিনি (রা.) বলেন, আমি হলাম এসব নিহত লোকের অভিভাবক, তাই রক্তপণ নির্ধারণ করে আমার সম্পদ থেকে আমি তা পরিশোধ করব। এটি হলো এ সম্পর্কে একটি রায়।

তাবারীর ইতিহাসের বর্ণনা অনুসারে হযরত উসমান (রা.) হযরত উবায়দুল্লাহ্ (রা.)-কে হুরমুযানের পুত্রের হাতে তুলে দিয়েছিলেন যেন সে তার পিতৃহত্যার বিনিময়ে শাস্তিস্বরূপ তাকে হত্যা করে, কিন্তু তার পুত্র (তাকে) ক্ষমা করে দেয়। এর ব্যাখ্যায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একটি সমস্যার সমাধান তুলে ধরতে গিয়ে এই প্রশ্ন উঠিয়েছেন যে, নিহত একত্ববাদী কাফেরের বিনিময়ে মুসলমান হন্তারককে শাস্তি দেয়া যায় কি-না? আর তিনি (রা.) সেই ঘটনা বর্ণনা করেন যা বিগত এক জুমুআর খুতবায় আমি বর্ণনা করেছি, তথাপি বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য এখানে পুনরায় বর্ণনা করছি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,

তাবারীতে কুমাযবান বিন হুরমুযান তার পিতার হত্যার ঘটনা বর্ণনা করেন। হুরমুযান একজন ইরানী নেতা ও অগ্নি উপাসক ছিল এবং দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.)-এর হত্যার ষড়যন্ত্রে সে সন্দেহভাজন ছিল। এতে কোন ধরনের তদন্ত ছাড়াই উত্তেজনার বশে উবায়দুল্লাহ্ বিন উমর তাকে হত্যা করে বসেন। সেই পুত্র বলে, ইরানী লোকেরা মদিনায় পরস্পর মিলেমিশে বাস করত, যেভাবে প্রচলিত রীতি হলো ভিনদেশে যাওয়ার পর দেশপ্রেম প্রগাঢ় হয়ে যায়। একদিন ফিরোজ, অর্থাৎ যে হযরত উমরের হত্যাকারী ছিল, সে আমার পিতার সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তার কাছে একটি দু'ধারী খঞ্জর ছিল। (হুরমুযানের ছেলে এটি বর্ণনা করে যে,) আমার পিতা এই খঞ্জরটি নিয়ে নেয় এবং তাকে জিজ্ঞেস করে, এই দেশে এই খঞ্জর দিয়ে তুমি কী কাজ কর? অর্থাৎ এই দেশ তো শান্তিপূর্ণ দেশ, এখানে অস্ত্রের কী প্রয়োজন রয়েছে? সে বলে, আমি এটি দিয়ে উট হাঁকানোর কাজ করি। যখন তারা দুজন পরস্পর কথা বলছিল তখন কেউ তাদেরকে দেখে ফেলে আর হযরত উমর (রা.)-কে যখন হত্যা করা হয় তখন সে বলে, হুরমুযানকে আমি নিজে এই খঞ্জরটি ফিরোজকে দিতে দেখেছি। তখন হযরত উমরের ছোট ছেলে উবায়দুল্লাহ্ গিয়ে আমার পিতাকে হত্যা করে ফেলেন। যখন হযরত উসমান খলীফা নির্বাচিত হন, তখন তিনি আমাকে ডেকে পাঠান এবং উবায়দুল্লাহ্কে গ্রেফতার করে আমার হাতে তুলে দিয়ে বলেন, হে আমার পুত্র! এ হলো তোমার পিতার হত্যাকারী এবং তুমি আমাদের তুলনায় তার ওপর বেশি অধিকার রাখ। সুতরাং যাও এবং তাকে হত্যা কর। আমি তাকে ধরে নিয়ে শহরের বাইরে চলে আসি। পথিমধ্যে যার সাথেই আমার সাক্ষাৎ হতো সে আমার সাথে যোগ দিত, কিন্তু কেউই আমার সাথে লড়াই করতে আসে নি। তারা কেবল আমার নিকট এতটুকুই নিবেদন করত যে, আমি যেন তাকে ছেড়ে দিই। অতএব আমি (উপস্থিত) সকল মুসলমানকে সম্বোধন করে বলি, আমার কি তাকে হত্যা করার অধিকার আছে? সকলেই উত্তর দেয়, হ্যাঁ! তোমার অধিকার রয়েছে, তাকে হত্যা কর আর উবায়দুল্লাহ্কে তারা (এই বলে) ভর্ৎসনা করতে থাকে যে, সে এমন মন্দ কাজ করেছে। এরপর আমি জিজ্ঞেস করি, তোমাদের কি আমার হাত থেকে তাকে ছাড়িয়ে নেয়ার অধিকার আছে? তারা উত্তরে বলে, মোটেও নয় আর পুনরায় উবায়দুল্লাহ্কে (এই বলে) তিরস্কার করে যে, সে প্রমাণ ছাড়াই তার পিতাকে হত্যা করেছে। এ অবস্থায় আমি খোদা তা'লা এবং সেসব লোকের খাতিরে তাকে মুক্ত করে দেই আর মুসলমানরা আনন্দের আতিশয্যে আমাকে তাদের কাঁধে তুলে নেয়। খোদার কসম! আমি লোকজনের মাথা ও কাঁধে (আরোহিত অবস্থায়) আমার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছি আর তারা আমাকে মাটিতে পা পর্যন্ত রাখতে দেয় নি। এই রেওয়ায়েত থেকে সাব্যস্ত হয়, সাহাবীদের কর্মপন্থাও এটিই ছিল যে, তারা অ-মুসলিমের মুসলিম হত্যাকারীকে

মৃত্যুদণ্ড প্রদান করতেন আর এটিও সাব্যস্ত হয় যে, কেউ যে অস্ত্র দিয়েই নিহত হোক না কেন তাকে (অর্থাৎ হত্যাকারীকে) হত্যা করা হবে। অনুরূপভাবে এটিও প্রমাণিত হয় যে, হত্যাকারীকে গ্রেফতার করা ও তাকে শাস্তি প্রদানের দায়িত্ব রাষ্ট্রের ওপরই বর্তায়, কেননা এই রেওয়ায়েত থেকে প্রতীয়মান হয়, উবায়দুল্লাহ্ বিন উমরকে গ্রেফতারও হযরত উসমান (রা.)-ই করেন এবং তিনিই তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার জন্য হুরমুযানের পুত্রের হাতে তুলে দেন। হুরমুযানের কোন বংশধর তার বিরুদ্ধে মামলাও করে নি আর গ্রেফতারও করে নি।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এখানে এই সন্দেহের নিরসনও আবশ্যক যে, হন্তাকে শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে কি নিহত ব্যক্তির বংশধরদের হাতে তুলে দেয়া উচিত, যেমনটি হযরত উসমান করেছিলেন, নাকি স্বয়ং রাষ্ট্রেরই শাস্তি প্রদান করা উচিত? অতএব স্মরণ রাখা উচিত, এটি একটি আপেক্ষিক বিষয়, তাই ইসলাম এটিকে যুগের দাবির ওপর ছেড়ে দিয়েছে। জাতি তাদের স্বীয় সমাজ ব্যবস্থা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী যে পন্থাকে অধিক কল্যাণজনক মনে করে তা অবলম্বন করতে পারে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ দুটি পন্থাই বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে লাভজনক হয়ে থাকে।

এ ব্যাখ্যার পর এখন আমি হযরত উমর (রা.)-এর আরো কিছু ঘটনা উল্লেখ করছি। মৃত্যুর সময় হযরত উমর (রা.)-এর কাকুতিমিনতি, বিনয় ও নম্রতার চিত্র সম্পর্কে তার পুত্র বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর পুত্রকে বলেন, আমার কাফনে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে। আল্লাহ্‌র নিকট যদি আমার জন্য কল্যাণ থাকে তাহলে তিনি আমাকে এর চেয়ে উত্তম পোশাক দান করবেন। কিন্তু যদি আমি সেটির যোগ্য না হই তবে আমার কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নিবেন এবং সেটি খুব দ্রুত করবেন। এছাড়া আমার কবরের ব্যাপারেও মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে। আল্লাহ্‌র সমীপে যদি আমার জন্য এতে কল্যাণ থাকে তবে এটিকে আমার দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত করে দেবেন। কিন্তু আমি যদি এর ব্যতিক্রম হই তবে এটিকে আমার জন্য এতটা সংকীর্ণ করে দিবেন যে, আমার পাঁজরের হাড় ভেঙে যাবে। আমার জানাযার সাথে কোন নারীকে নিয়ে যাবে না। আমার এমন কোন প্রশংসা করবে না যা আমার মাঝে নেই, কেননা আল্লাহ্ আমাকে অধিক জানেন। আমাকে নিয়ে যাওয়ার সময় দ্রুত হাঁটবে। আল্লাহ্‌র কাছে যদি আমার জন্য কল্যাণ থাকে তবে তোমরা আমাকে সেই জিনিসের দিকে পাঠাচ্ছ যা আমার জন্য অধিক উত্তম, কিন্তু যদি তেমনটি না হয় তবে তোমরা তোমাদের কাধ থেকে এই অনিষ্টকে অপসারণ করবে যা তোমরা বহন করছ। এছাড়া এটিও উল্লেখ পাওয়া যায় যে, হযরত উমর (রা.) ওসীয়্যত করেছিলেন, আমাকে কস্তুরী প্রভৃতি দিয়ে গোসল দেবে না।

হযরত উসমান বিন আফ্‌ফান (রা.) থেকে বর্ণিত, আমি হযরত উমরের কাছে যাই যখন তার মাথা হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমরের উরুতে রাখা ছিল। হযরত উমর (রা.) তাকে, অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমরকে বলেন, আমার গাল মাটিতে রেখে দাও। তখন হযরত আব্দুল্লাহ্ বলেন, আমার উরু এবং মাটি একই সমতলে রয়েছে, অর্থাৎ এতে আর কতটুকুই-বা ব্যবধান রয়েছে! হযরত উমর (রা.) দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার বলেন, তোমার মঙ্গল হোক! আমার মাথা মাটিতে রেখে দাও। এরপর হযরত উমর (রা.) নিজের দুই পা একত্রিত করেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমি হযরত উমর (রা.)-কে (একথা) বলতে শুনি যে, আমি এবং আমার মায়ের ধ্বংস, যদি আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা না করেন, এ অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

হযরত সিমাক হানাফী বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা.)-কে বলতে শুনেছি, আমি হযরত উমরকে বললাম, আল্লাহ্ আপনার মাধ্যমে নতুন শহর আবাদ করেছেন, আপনার মাধ্যমে অনেক বিজয় অর্জিত হয়েছে এবং আপনার মাধ্যমে অমুক অমুক কাজ হয়েছে। তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, আমার তো আকাঙ্ক্ষা হলো এ থেকে আমি যেন সেভাবে মুক্তি লাভ করি যেন আমার জন্য কোন পুরস্কারও না থাকে আর কোন বোঝাও না থাকে। অর্থাৎ এর জন্য

গর্বের কিছু নেই যে, আমি বড় বড় কাজ করেছি এবং আমার যুগে বড় বড় বিজয় অর্জিত হয়েছে, বরং আল্লাহ্ তা'লার ভয় ও ভীতির প্রাধান্য ছিল এবং পরকালের চিন্তা ছিল।

যায়েদ বিন আসলাম তার পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন হযরত উমরের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে তখন তিনি বলেন, তোমরা আমার প্রতি ইমারত সম্পর্কে সন্দেহ করে থাক, কিন্তু খোদার কসম, আমি তো পছন্দ করি, আমি যেন এমনভাবে মুক্তি লাভ করি যে, لاعلى ولاعلى (লা আলাইয়া ওয়ালা আলী) অর্থাৎ আমি কোন পুরস্কার চাই না আর আমাকে যেন শাস্তিও দোয়া না হয়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ সম্পর্কে বলেন,

হযরত উমর (রা.)-এর ন্যায় মানুষ, যিনি তার সারা জীবনই ইসলাম ধর্মের বেদনা ও চিন্তায় (নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য) ভুলে গেছেন। যিনি প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নত থেকে উন্নততর ত্যাগ স্বীকার করেছেন, যদিও আমলের দিক থেকে তাঁর ত্যাগ হযরত আবু বকর (রা.)-এর কুরবানীর মানে পৌঁছে নি, কিন্তু ইচ্ছা ও নিয়্যতের দিক থেকে সবার (কুরবানী) এক সমান ছিল। হযরত আবু বকর (রা.) যখন মৃত্যু বরণ করেন তখন হযরত উমর (রা.)-এর চোখ থেকে অশ্রু বইতে থাকে। আর তিনি বলেন, খোদা তা'লা আবু বকর (রা.)-এর প্রতি কল্যাণ বর্ষণ করুন। আমি বহুবার তাঁর চেয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কখনো সফল হই নি। একবার মহানবী (সা.) বলেন, আর্থিক কুরবানী কর, তখন আমি আমার অর্ধেক সম্পদ নিয়ে উপস্থিত হই আর ভাবি যে, আজ আমি হযরত আবু বকর (রা.)-এর চেয়ে এগিয়ে যাব। কিন্তু আবু বকর (রা.) আমার পূর্বেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন আর তার সাথে যেহেতু মহানবী (সা.)-এর সম্পর্কও ছিল এবং তিনি (সা.) জানতেন যে, তিনি কিছুই ছেড়ে আসেন নি, তাই তিনি জিজ্ঞেস করেন, হে আবু বকর! ঘরে কী রেখে এসেছ? তিনি বলেন, ঘরে খোদা এবং রসূল (সা.)-এর নাম রেখে এসেছি। এ কথা বলে হযরত উমর কাঁদতেন এবং বলতেন, তখনও আমি তাঁর চেয়ে এগিয়ে যেতে পারি নি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এগুলো ছিল তাঁর কুরবানী। হযরত আবু বকর (রা.) পূর্বেও দান করতেন, কিন্তু যখন বিশেষ উপলক্ষ্য আসে তখন তিনি সবকিছু এনে উপস্থাপন করেন। একদিকে ছিলেন এরা আর অপরদিকে রয়েছে তারা যারা নিজেদের সম্পদের এক-দশমাংশ কুরবানী করারও সৌভাগ্য পায় না অথচ বলে বেড়ায় যে, আমরা সর্বস্বান্ত হয়ে গেলাম।

মৃত্যু বরণের সময় হযরত উমর (রা.)-এর চোখ বার বার অশ্রুসজল হয়ে উঠতো আর তিনি বলতেন, হে খোদা! আমি কোন পুরস্কারের যোগ্য নই। আমি কেবল শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে চাই। অতঃপর দাফন এবং জানাযা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ্ তাকে গোসল দেন। হযরত ইবনে উমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, মসজিদে নববীতে হযরত উমরের জানাযার নামায আদায় করা হয় আর হযরত সোহায়েব তাঁর জানাযার নামায পড়ান। মহানবী (সা.)-এর মিম্বর ও কবরের মধ্যবর্তী স্থানে তাঁর জানাযার নামায আদায় করা হয়। হযরত জাবের থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উমরকে কবরে নামানোর জন্য উসমান বিন আফফান, সাঈদ বিন যায়েদ, সোহায়েব বিন সিনান আর আব্দুল্লাহ্ বিন উমর নেমেছিলেন। তাদের ছাড়া হযরত আলী, হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ, হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস এবং হযরত তালহা আর হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম এর নামও পাওয়া যায়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

পুণ্যবানদের পাশে দাফন হওয়াও এক নেয়ামত। হযরত উমর (রা.) সম্পর্কে লিখিত আছে যে, মৃত্যু শয্যায় থাকা অবস্থায় তিনি হযরত আয়েশার কাছে বার্তা পাঠান যে, মহানবী (সা.)-এর (কবরের) পাশের জায়গাটি যেন তাকে দেয়া হয়। হযরত আয়েশা (রা.) ত্যাগ স্বীকার করে সেই স্থানটি তাকে দিয়ে দিলে তিনি বলেন, **'মা বাকেয়া লী হাম্মুন বা'দা যালিক'**

অর্থাৎ এখন এরপর আমার আর কোন দুঃখ নেই যখনকিনা আমি মহানবী (সা.)-এর রওজায় সমাহিত হব।

অপর এক স্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

যে ব্যক্তি পূর্ণ আগ্রহের সাথে আল্লাহ্ তা'লার আঁচলকে আঁকড়ে ধরে তাকে তিনি কখনো বিনষ্ট করেন না, যদিও জগতের প্রতিটি বস্তুই তার শত্রু হয়ে যাক না কেন। আর আল্লাহ্র সন্ধানী কোন ক্ষতি বা কষ্টের সম্মুখীন হয় না। আল্লাহ্ তা'লা সত্যবাদীদের অবান্ধব ও অসহায় পরিত্যাগ করেন না। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। তাদের উভয়ের অর্থাৎ আবু বকর ও উমরের সততা ও নিষ্ঠা কতই না উন্নত মানের! তারা উভয়ে এমন বরকতমণ্ডিত সমাধিস্থলে সমাহিত হয়েছেন যে, মূসা ও ঈসা (আ.) যদি জীবিত থাকতেন তাহলে শত ঈর্ষার সাথে সেখানে সমাহিত হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতেন, কিন্তু এই মর্যাদা কেবল বাসনা থাকলেই লাভ হতে পারে না, আর কেবল চাইলেই তা প্রদান করা যায় না, বরং এটি তো সর্বাধিপতি খোদা পক্ষ থেকে এক স্থায়ী কৃপা আর এই কৃপা কেবল সেসব লোকের প্রতিই অবতীর্ণ হয় যাদের প্রতি ঐশী দান সদা মনোযোগী থাকে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,

হযরত উমর যখন মৃত্যু পথযাত্রী ছিলেন তখন তিনি মহানবী (সা.)-এর চরণে সমাহিত হওয়ার মানসে পরম ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন। অতএব তিনি হযরত আয়েশাকে বলে পাঠান যে, আপনি অনুমতি দিলে আমি তাঁর (সা.)-এর পাশে সমাহিত হতে চাই। হযরত উমর সেই মানুষ ছিলেন যার সম্পর্কে খ্রিষ্টান ঐতিহাসিকরাও লিখে যে, তিনি এমনভাবে রাজত্ব করেছেন যা জগতে আর কেউ করে নি। তারা অর্থাৎ খ্রিষ্টান ঐতিহাসিকরা মহানবী (সা.)-কে গালি দেয়, কিন্তু হযরত উমর (রা.)-এর প্রশংসা করে। সার্বক্ষণিক সান্নিধ্য লাভকারী ব্যক্তি মৃত্যুর সময়ও এই বাসনা ব্যক্ত করেন যে, মহানবী (সা.)-এর চরণে যেন তার ঠাঁই হয়। যদি মহানবী (সা.)-এর কোন একটি কাজেও এই বিষয়টি প্রকাশ পেতো যে, তিনি খোদার সন্তুষ্টির জন্য কাজ করেন না, তাহলে কী হযরত উমরের ন্যায় ব্যক্তি এরূপ মর্যাদায় উপনীত হয়ে কখনো তাঁর (সা.) চরণে স্থান লাভের বাসনা করতেন? অতএব এটিই মহানবী (সা.)-এর মর্যাদা, যার কারণে হযরত উমরেরও তাঁর (সা.) চরণে স্থান লাভের বাসনা হয়েছে।

মৃত্যুর সময় হযরত উমরের বয়স কত ছিল– এ সম্পর্কেও বিভিন্ন মত রয়েছে। জন্মসাল সম্পর্কেও বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে, এ কারণে মৃত্যুর সন সম্পর্কেও ভিন্ন ভিন্ন উক্তি রয়েছে। যেমন তাবারি, উসদুল গাবা, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, রিয়াযুন নাযারা, তারীখুল খুলাফা ইত্যাদি গ্রন্থের বিভিন্ন রেওয়াতে তাঁর বয়স ৫৩ বছর, ৫৫ বছর, ৫৭ বছর, ৫৯ বছর, ৬১ বছর, ৬৩ বছর এবং ৬৫ বছর বর্ণিত হয়েছে। যদিও সহীহ্ মুসলিম ও তিরমিযির রেওয়ায়েত অনুযায়ী তাঁর বয়স ৬৩ বছর বর্ণনা করা হয়েছে।

হযরত আনাস বিন মালেক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, মৃত্যুর সময় মহানবী (সা.)-এর বয়স ছিল ৬৩ বছর, হযরত আবু বকর এর মৃত্যুর সময় বয়স ছিল ৬৩ বছর আর হযরত উমরেরও মৃত্যুর সময় বয়স ছিল ৬৩ বছর। হযরত উমরের মৃত্যুতে কতিপয় সাহাবীর অভিব্যক্তি রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন যে,

হযরত উমরের পবিত্র শবদেহ জানাযার জন্য রাখা হয় আর মানুষ তাঁর আশেপাশে দাঁড়িয়ে যায়। তাকে উঠানোর পূর্বে তারা দোয়া করতে থাকে। এরপর তারা জানাযার নামায পড়ে আর আমিও তাদের মাঝে উপস্থিত ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি আমার কাঁধে হাত রেখে আমাকে চকিত করে। আমি দেখি যে, তিনি হলেন হযরত আলী বিন আবি তালেব। তিনি হযরত উমরের জন্য রহমত কামনা করে দোয়া করেন আর বলেন, তিনি এমন কোন ব্যক্তিকে রেখে যান নি যে আমার কাছে এই দিক থেকে তার চেয়ে অধিক প্রিয় হবে যে, আমি তার

মতো আমল করে আল্লাহ্ তা'লার সাথে মিলিত হব। খোদার কসম, আমি এটিই মনে করতাম যে, আল্লাহ্ তা'লা তাকেও তার সাথীদের সাথেই রাখবেন, অর্থাৎ হযরত উমরকেও তার সাথীদের সাথেই রাখবেন। আর আমি জানি, মহানবী (সা.)-এর কাছে বহুবার আমি এটি শুনেছি যে, তিনি বলতেন, **'যাহাবতু আনা ওয়া আবু বকরীন ওয়া উমর, ওয়া দাখালতু আনা ওয়া আবু বকরীন ওয়া উমর, ওয়া খারাজতু আনা ওয়া আবু বকরীন ওয়া উমর'**। অর্থাৎ, আমি এবং আবু বকর আর উমর যাই, আমি এবং আবু বকর আর উমর প্রবেশ করি, আমি এবং আবু বকর আর উমর বের হই। অর্থাৎ বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে এই বাক্যগুলো তিনি উচ্চারণ করতেন।

জাফর বিন মুহাম্মদ তার পিতার বরাতে বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-কে যখন গোসল করানোর পর কফনের কাপড় পরিধান করিয়ে খাটিয়ায় শুইয়ে রাখা হয়, তখন হযরত আলী (রা.) তার লাশের পাশে দাঁড়িয়ে তার প্রশংসা করেন এবং বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, এই চাদরে আবৃত ব্যক্তির তুলনায় অন্য কেউ এই ধরাপৃষ্ঠে আমার কাছে বেশি প্রিয় নয় যার আমলনামা নিয়ে আমি খোদার দরবারে উপস্থিত হব।

আবু মাখলাদ বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী বিন আবি তালেব বলেন, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পূর্বেই আমরা বুঝতে পারি যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পর আমাদের মাঝে হযরত আবু বকর সর্বোত্তম ব্যক্তি। আর হযরত আবু বকর (রা.)-এর মৃত্যুর পূর্বেই আমরা বুঝতে পারি যে, হযরত আবু বকর (রা.)-এর অবর্তমানে হযরত উমর (রা.) আমাদের মাঝে সর্বোত্তম ব্যক্তি। জায়েদ বিন ওয়াহাব বর্ণনা করেন যে, আমরা হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.)-র নিকট গেলে তিনি হযরত উমর (রা.)-এর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এত বেশি কাঁদেন যে, তার চোখের জলে কঙ্কর পর্যন্ত সিক্ত হয়ে যায়। এরপর তিনি বলেন, হযরত উমর (রা.) ইসলামের সুরক্ষিত দুর্গ ছিলেন, মানুষ এতে প্রবেশ করে আর বের হতো না। তিনি একটি দৃঢ় দুর্গসদৃশ ছিলেন যাতে প্রবেশের পর মানুষ আর বের হতো না। তার মৃত্যুতে এই দুর্গে ফাঁটল সৃষ্টি হয়েছে এবং মানুষ ইসলাম পরিত্যাগ করছে।

আবু ওয়ায়েল বর্ণনা করেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) বলেন, হযরত উমর (রা.)-এর জ্ঞান যদি এক পাল্লায় আর অন্য সকল মানুষের জ্ঞান অপর পাল্লায় রাখা হয় তবে হযরত উমরের পাল্লা ভারী হবে। আবু ওয়ায়েল বলেন, ইব্রাহীমের কাছে আমি এর উল্লেখ করলে তিনি বলেন, খোদার কসম! বিষয়টি এরূপই, আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) এর চেয়েও বড় কথা বলেছেন। আমি জিজ্ঞেস করি যে, তিনি কী বলেছেন? তিনি বলেন, হযরত উমর (রা.)-এর মৃত্যুর পর তিনি বলেন যে, জ্ঞানের দশ ভাগের নয় ভাগ হারিয়ে গেছে।

হযরত আনাস (রা.) বলেন, হযরত উমর (রা.)-এর শাহাদাত হলে হযরত আবু তালহা বলেন, আরবে শহুরে বা গ্রাম্য এমন কোন ঘর নেই যেটি হযরত উমর (রা.)-এর শাহাদাতের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। অর্থাৎ, তিনি সবার এতটা সাহায্য-সহযোগিতা করতেন যে, তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে বা প্রভাবিত হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সালাম হযরত উমর (রা.)-এর জানাজার পর হযরত উমর (রা.)-এর খাটিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে বলেন, হে উমর! আপনি কতইনা উত্তম মুসলিম ভাই ছিলেন, সত্যের জন্য উদার এবং মিথ্যার জন্য কৃপণ ছিলেন। সন্তুষ্টি প্রকাশের ক্ষেত্রে আপনি সন্তুষ্ট হতেন এবং ক্রোধের সময় আপনি রাগ করতেন। আপনি পবিত্র দৃষ্টি ও বড় মনের মানুষ ছিলেন। অহেতুক প্রসংশাকারীও ছিলেন না আর গীবত তথা পরনিন্দাকারীও ছিলেন না। একটি রেওয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উমর (রা.)-এর মৃত্যুতে হযরত সাঈদ বিন যায়েদ যখন কাঁদছিলেন তখন জনৈক ব্যক্তি বলেন, হে আবুল আ'ওর! আপনি কেন কাঁদছেন? তিনি

বলেন, আমি ইসলামের জন্য কাঁদছি। নিশ্চিতভাবে হযরত উমর (রা.)-এর মৃত্যুতে ইসলামে এমন বিপত্তি দেখা দিয়েছে, যা কিয়ামত পর্যন্ত পূর্ণ হবে না।

হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবদ্দশায় আমরা বলতাম, মহানবী (সা.)-এর উম্মতে তাঁর পর সর্বোত্তম হলেন হযরত আবু বকর (রা.), এরপর হযরত উমর (রা.), অতঃপর হযরত উসমান (রা.)। হযরত হুযায়ফা বলেন, হযরত উমর (রা.)-এর যুগে ইসলামের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মতো ছিল যে ক্রমাগতভাবে উন্নতির পথে ধাবমান ছিল। তাঁর শাহাদাতে সেই যুগ পিঠ ফিরিয়ে নেয় আর এখন অনবরত পেছনের দিকে যাচ্ছে।

হযরত উমর (রা.)-এর সহধর্মিনী ও সন্তানদের বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে যে, বিভিন্ন সময় তাঁর দশজন সহধর্মিনী ছিলেন যাদের গর্ভে নয়জন পুত্র ও চার জন কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। তাদের মাঝে একজন ছিলেন হযরত হাফসা (রা.) যিনি মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সহধর্মিণী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। হযরত যয়নব বিন মাযঊন ছিলেন প্রথম স্ত্রী যিনি হযরত উসমান বিন মাযঊনের সহোদরা ছিলেন এবং যার গর্ভে হযরত উমর (রা.)-এর পুত্র আবদুল্লাহ্, আব্দুর রহমান আকবর এবং কন্যা হযরত হাফসার জন্ম হয়।

(তাঁর সহধর্মিনী) হযরত উম্মে কুলসুম বিনতে আলী বিন আবু তালেবের গর্ভে যায়েদ আকবর এবং রুকাইয়্যার জন্ম হয়। মোলায়কা বিনতে যারওয়াল যিনি উম্মে কুলসুম নামেও সুপরিচিত। তার গর্ভে যায়েদ আসগার এবং উবায়দুল্লাহ্‌র জন্ম হয়। কুরায়বা বিনতে আবু উমাইয়া মাখযুমী। যেহেতু মোলায়কা এবং কুরায়বা ঈমান আনেন নি তাই হযরত উমর (রা.) ষষ্ঠ হিজরীতে তাদের উভয়কে তালাক দিয়ে দেন। হযরত জামিলা বিনতে সাবেত, পূর্বে যার নাম ছিল আসিয়া, মহানবী (সা.) তার নাম পরিবর্তন করে জামিলা রাখেন। তিনি বদরী সাহাবী হযরত আসেম বিন সাবেত (রা.)-এর সহোদরা ছিলেন। তার ঘরে হযরত উমরের যে সন্তান হয় তার নাম আসেম। লাওহিয়ার গর্ভে তাঁর (রা.) সন্তান আব্দুর রহমান আওসাতের জন্ম হয়। আরেকজন সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি উম্মে ওয়ালাদ ছিলেন (অর্থাৎ সেই দাসী যার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে যদি সন্তানের জন্ম হয় তাহলে সে দাসী স্বাধীন হয়ে যায়) যার গর্ভে আব্দুর রহমান আসগারের জন্ম হয়। হযরত উম্মে হাকিম বিনতে হারেসের গর্ভে তাঁর কন্যা ফাতেমার জন্ম হয়। ফুকায়হার গর্ভে তাঁর সন্তান যয়নবের জন্ম হয়। হযরত আতেকা বিনতে যায়েদের গর্ভে তাঁর পুত্র আইয়্যাযের জন্ম হয়।

হযরত উমর (রা.)-এর প্রশংসায় প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ এডওয়ার্ড গিবন লিখেন, হযরত উমরের ধার্মিকতা এবং বিনয় হযরত আবু বকরের পুণ্যের তুলনায় কোন অংশে কম ছিল না। তাঁর খাবারের তালিকায় ছিল কেবল জবের রুটি এবং খেজুর। পানীয় বলতে ছিল কেবল সুপেয় পানি। বারো জায়গায় ছিঁড়ে যাওয়া আলখেল্লা পরে তিনি মানুষকে তবলীগ করতেন। ইরানের যে গভর্নর এ বিজেতাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছেন তিনি হযরত উমরকে মসজিদে নববীর সিঁড়িতে ফকীর-দরবেশদের সাথে ঘুমাতে দেখেছেন। অর্থকড়ি লাগামহীন চিন্তাধারার উৎস হয়ে থাকে। আয়উপার্জন বৃদ্ধির কারণে উমর এই যোগ্যতা লাভ করেন যে, নিষ্ঠাবানদের পূর্বাপর সেবার নিরিখে তাদের জন্য ন্যায়সঙ্গত ও স্থায়ী ভাতার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হন। নিজের ভাতার বিষয়ে তিনি ভ্রুক্ষেপহীন ছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম মহানবী (সা.)-এর চাচা হযরত আব্বাসের জন্য পঁচিশ হাজার দিরহাম অথবা রুপার টুকরোর পর্যাপ্ত পরিমাণ ভাতা নির্ধারণ করেন। বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মহান সাহাবীদের প্রত্যেকের জন্য পাঁচ হাজার দিরহাম ভাতা নির্ধারণ করেন। মহানবী (সা.)-এর অন্যান্য সাহাবীদের বাৎসরিক তিন হাজার রুপার টুকরো দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

মাইকেল এইচ হার্ট তার পুস্তক 'দি হানড্রেড'-এ ইতিহাসের একশজন প্রভাবশালী ব্যক্তির তালিকা প্রণয়ন করেছেন এবং ১ নম্বরে রেখেছেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নাম আর উক্ত কিতাবের ৫২ নম্বরে হযরত উমর (রা.)-এর নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেন, উমর বিন খাত্তাব মুসলমানদের দ্বিতীয় খলীফা এবং সম্ভবত মুসলমানদের মাঝে সবচেয়ে মহান খলীফা ছিলেন। তিনি মহানবী (সা.)-এর সমসাময়িক যুবক এবং তাঁর ন্যায় মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের বছর সুনির্দিষ্টভাবে জানা নেই, তবে সম্ভবত ৫৮৬ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি হবে। প্রারম্ভিক যুগে হযরত উমর ছিলেন মহানবী (সা.)-এর নবধর্মের সবচেয়ে কঠোর শত্রু, কিন্তু হঠাৎ-ই হযরত উমর ইসলাম গ্রহণ করেন এবং এরপর তিনি তাঁর (সা.) শক্তিশালী সাহায্যকারী হয়ে যান। সেইন্ট পল-এর খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করার সাথে তাঁর ইসলাম গ্রহণের অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে। উমর মুহাম্মদ (সা.)-এর নিকটতম উপদেষ্টাদের অন্তর্ভুক্ত হন এবং তাঁর (সা.) মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এমনই ছিলেন। ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে নিজের কোন স্থলাভিষিক্ত মনোনীত না করেই মুহাম্মদ (সা.) মৃত্যু বরণ করেন। উমর তৎক্ষণাৎ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ঘনিষ্ঠ সাথী ও শ্বশুর আবু বকরের খিলাফতের প্রতি সমর্থন জানান; ফলে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব টলে যায়। তিনি নিজস্ব ভঙ্গিতে লিখেছেন, কেননা তারা মানতে প্রস্তুত নয় যে, মানুষজন ঐক্যবদ্ধভাবে তাকে খলীফা নির্বাচিত করেছে। জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি বলেন যে, উমর নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর শ্বশুরের হাতে বয়আত করেন, যার ফলে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব প্রশমিত হয়ে যায় এবং এর ফলে আবু বকরকে সর্বস্বীকৃতভাবে প্রথম খলীফা, অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.)-এর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে মানা হয়। আবু বকর একজন সফল নেতা ছিলেন, কিন্তু তিনি কেবল দু'বছরের জন্য খলীফা হিসেবে দায়িত্বপালনের পর তিনি মৃত্যু বরণ করেন। তিনি সুনির্দিষ্টভাবে তার অবর্তমানে স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি হিসেবে উমরের নাম প্রস্তাব করেন। উমর ছিলেন মহানবী (সা.)-এর শ্বশুর; ফলে আরেকবার ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্ব টলে যায়। তিনি (মাইকেল এইচ. হার্ট) বিষয়টিকে জাগতিকরূপ দিতে চাচ্ছেন; যাহোক তিনি প্রশংসা করছেন। উমর ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে খলীফা হন এবং ৬৪৪ সাল পর্যন্ত খিলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তিনি ক্ষমতায় থাকাকালে অর্থাৎ খিলাফতে অধিষ্ঠিত অবস্থায় একজন ইরানী ক্রীতদাস মদিনায় তাঁকে শহীদ করে। তিনি মৃত্যুশয্যায় তাঁর অবর্তমানে স্থলাভিষিক্ত নির্বাচনের জন্য ছয়সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করেন, যা এভাবে আরেকবার ক্ষমতা নিয়ে সম্ভাব্য সশস্ত্র যুদ্ধ টলিয়ে দেয়। এই কমিটি উসমানকে তৃতীয় খলীফা নির্বাচন করে, যিনি ৬৪৪ সাল থেকে ৬৫৬ সাল পর্যন্ত শাসন করেন। অতঃপর তিনি লিখেন, হযরত উমর (রা.)-এর এই দশ বছরের খিলাফতকালেই আরবরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিজয়গুলো লাভ করে। তাঁর খিলাফতের সংক্ষিপ্ত সময়েই আরব বাহিনী রোমান সাম্রাজ্যাধীন সিরিয়া এবং ফিলিস্তিন আক্রমণ করে। ৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দে আরব বাহিনী বাইজেন্টাইন তথা রোমানদের বিরুদ্ধে ইরারমূকের যুদ্ধে এমন বিরাট জয় লাভ করে যার ফলে তাদের কোমর ভেঙে যায়। একই বছর দামেস্ক বিজয় হয়। অতঃপর দু'বছর পর জেরুযালেম অস্ত্রসমর্পণ করে। ৬৪১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আরব বাহিনী গোটা ফিলিস্তিন এবং সিরিয়া জয় করে নেয় আর বর্তমান তুরস্কের দিকে অগ্রসর হয়। ৬৩৯ খ্রিষ্টাব্দে আরবরা রোমান সাম্রাজ্যাধীন মিশরে প্রবেশ করে। তিন বছরের মধ্যে তারা পুরো মিশরে আধিপত্য বিস্তার করে। হযরত উমর (রা.) খিলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই আরবরা পারস্য সাম্রাজ্যাধীন ইরাক আক্রমণ করে। হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতে ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে কাদসিয়ার যুদ্ধের মাধ্যমে আরবদের মূল বিজয় সূচিত হয়। ৬৪১ খ্রিষ্টাব্দের ভেতর গোটা ইরাক আরবদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে আর তারা এখানেই থেমে থাকে নি বরং এরপর তারা পারস্য তথা ইরানেও আক্রমণ করে। ৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে নাহাওয়ান্দের যুদ্ধে তারা পারস্যের সর্বশেষ বাদশা'র সেনাদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। হযরত উমর (রা.)-এর মৃত্যুর সময়, অর্থাৎ ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিম ইরানের অধিকাংশ

অঞ্চল আরবদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। হযরত উমর (রা.)-এর মৃত্যুতেও আরব সেনাবাহিনী দমে যায় নি। পূর্ব দিকে তারা দ্রুততম সময়ে পারস্য বিজয় নিশ্চিত করে আর পাশাপাশি পশ্চিম দিকে উত্তর আফ্রিকার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। তিনি (মাইকেল এইচ. হার্ট) লিখেন, উমরের বিজয়াভিযানের ব্যাপ্তি যতটা তাৎপর্যপূর্ণ, এই বিজিত অঞ্চলগুলোর দৃঢ়তাও ততটাই গুরুত্বপূর্ণ। যদিও ইরানীরা মুসলমান হয়ে গিয়েছিল কিন্তু অবশেষে তারা আরব-শাসন থেকে বেরিয়ে যায়, যেখানে সিরিয়া, ইরাক এবং মিশরের অধিবাসীরা এমনটি করে নি। তারা আরব সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে একাকার হয়ে যায় এবং আজ অবধি এমনই আছে। তিনি আরো লিখেন, নিঃসন্দেহে উমর (রা.)-কে তার সেনাবাহিনী কর্তৃক বিজিত বিশাল সাম্রাজ্যের সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল পরিচালনার স্বার্থে নিয়মনীতি প্রণয়ন করতে হয়েছে। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, বিজিত অঞ্চলসমূহে আরবদের যেন একটি বিশেষ সামরিক অবস্থান লাভ হয় এবং তারা স্থানীয় অধিবাসীদের থেকে পৃথকভাবে সেনানিবাসে অবস্থান করে। অধীনস্থ লোকদের মুসলমান আরব বিজেতাদেরকে কেবল একটি কর দিতে হতো। তাদের পুরো শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ছিল। এছাড়া তাদের ওপর আর কোন দায়িত্ব ছিল না; বিশেষত মুসলমান হওয়ার জন্য তাদেরকে বাধ্য করা হত না। উক্ত কথা দ্বারা এটি প্রমাণিত হয় যে, আরবের এসব অভিযান বা যুদ্ধ ধর্মীয় লড়াই থেকে বেশি জাতিগত বিষয় ছিল। যদিও ধর্মীয় দিক ছিল না– তা বলা যাবে না। উমর (রা.)-এর সফলতা নিঃসন্দেহে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পর ইসলামের বিস্তারে মূল ব্যক্তিত্ব তিনিই ছিলেন। তার (রা.) এই দ্রুত অর্জিত বিজয় ব্যতীত সম্ভবত আজ ইসলাম যতটা বিস্তৃত রয়েছে, ততটা বিস্তৃতি লাভ করত না। অধিকন্তু হযরত উমর (রা.)-এর যুগে বিজিত ভূখণ্ড আজও আরব অঞ্চল হিসেবেই বিদ্যমান। নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ (সা.), যিনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিলেন, অধিকাংশ উন্নতির কৃতিত্ব তারই প্রাপ্য। কিন্তু হযরত উমর (রা.)-এর ভূমিকা অস্বীকার করাও মস্তবড় ভুল হবে। তার (রা.) বিজয় মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রভাবাধীন থাকার ফলাফলসরূপ এমনিতেই হয়ে যায় নি। কিছুটা বিস্তৃতি অবশ্যই নির্ধারিত ছিল, কিন্তু সেই অসাধারণ সীমা পর্যন্ত নয় যতটা হযরত উমর (রা.) যোগ্য নেতৃত্বে লাভ হয়েছে। পুনরায় তিনি লিখেন, পশ্চিমা বিশ্বের কাছে উমর (রা.)-এর মতো অপরিচিত ব্যক্তিত্বকে শারলিমান এবং জুলিয়াস সিজারের মতো প্রখ্যাত ব্যক্তিদের চেয়ে উচ্চ মর্যাদার আখ্যা দেয়া হয়ত বিস্ময় সৃষ্টি করবে, কিন্তু উমর (রা.)-এর যুগে আরবের বিজয়গাথা শারলিমান এবং জুলিয়াস সিজারের তুলনায় এর বিশালতা এবং সময়ের দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক বেশি গুরুত্ব রাখে।

এরপর প্রফেসর ফিলিপ কে.এ.টি. তার পুস্তক **'হিস্ট্রি অব দি আরব'**-এ লিখেন, সরল প্রকৃতি সম্পন্ন, মিতব্যয়ী এবং মহানবী (সা.)-এর গতিশীল ও যোগ্য উত্তরসূরী উমর (রা.), যিনি লম্বা এবং সুঠাম দেহ বিশিষ্ট ছিলেন এবং স্বল্পকেশী ছিলেন, তিনি (রা.) খিলাফতের দায়িত্ব লাভের পর কিছুদিন ব্যবসা-বাণিজ্য করে জীবন যাপনের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি তার পুরো জীবন এক মরু-নেতার ন্যায় সরলতার মাঝে অতিবাহিত করেছেন। মূলত উমর (রা.), যার নাম মুসলিম রেওয়ায়েত অনুসারে ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুহাম্মদ (সা.) এর পর সবচেয়ে মহান ছিল; তাকে মুসলমান ঐতিহাসিকরা তাকওয়া, ন্যায়পরায়ণতা এবং সরলতার জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে এবং খলীফার মাঝে বিদ্যমান সকল গুণাবলীর মূর্ত প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করেছে। পুনরায় লিখেন, তার উন্নত চরিত্র সকল বিবেকসম্পন্ন স্থলাভিষিক্তের জন্য অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। বলা হয়, তার কাছে কেবলমাত্র একটি জামা এবং একটি আচকান ছিল আর দুটোতেই স্পষ্টভাবে তালি দেখা যেত। তিনি সামান্য খেজুরের পাতার বিছানায় ঘুমোতেন। ঈমানের দৃঢ়তা, ন্যায়ের রাজ তথা ইসলামের উন্নতি এবং নিরাপত্তা ছাড়া তার অন্য কোন চিন্তা ছিল না। এই বর্ণনা আগামীতেও ধারাবাহিক ভাবে চলতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

এখন আমি কয়েকজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করব যাদের মাঝে সর্বপ্রথম মোকররমা সাহেবযাদী আসেফা মাসুদা বেগম সাহেবার স্মৃতিচারণ করা হবে। তিনি হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের ছেলে ডাক্তার মির্যা মোবাশ্বের আহমদ সাহেবের সহধর্মিণী ছিলেন। কিছুদিন পূর্বে তিনি ৯২ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দৌহিত্রী এবং হযরত নওয়াব মোবারেকা বেগম সাহেবা ও হযরত নওয়াব মোহাম্মদ আলী খান সাহেবের সর্বকনিষ্ঠ কন্যা ছিলেন। তিনি ছিলেন হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)-এর পুত্রবধূ। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি ওসীয়্যতকারিণী ছিলেন। তার অবর্তমানে তিনি এক পুত্র এবং চার কন্যা রেখে গেছেন। তার ছেলে তারেক আকবর সাহেব বলেন, আম্মি সর্বদা জামা'তের প্রতি এবং যুগ খলীফার প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। সর্বদা জামা'তের সেবা করার এবং ওসীয়্যতের শর্ত পূরণের চেষ্টা করতেন। তিনি তার জীবদ্দশায় হিস্যায়ে জায়েদাদ পরিশোধ করেছেন। প্রত্যেক বছর মরহুমদের পক্ষ থেকে চাঁদা প্রদান করতেন। দরিদ্রদের গোপনে মুক্তহস্তে দান করতেন। কর্মচারীদের বিষয়ে আমাকে তিনি সর্বদাই বলতেন, এরা তোমার ভাই-বোনের মতো, অতএব এদের খেয়াল রেখো। তিনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার চেষ্টা করতেন। তিনি সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন যেন তাদের কোনরূপ কষ্ট না হয়। নামাযে নিয়মিত এবং আল্লাহ্‌র হক ও বান্দার হক আদায়কারী একজন মহিলা ছিলেন। তার পুত্রবধু নাঈমা সাহেবা বলেন, আমেরিকায় আমাদের ঘরের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে তিনি বলেন, এই ঘরে জিনিসপত্র ঢুকানোর পূর্বে প্রতিটি কক্ষে ও কোণায় নফল পড়ে নিও। তিনি আরো বলেন, আমার মায়ের মৃত্যুর পর তিনি আমাকে বলেন, তুমি ভাববে না যে, তুমি মাতৃহীন, আমি তোমার মা। আর সত্যিই তার ভালোবাসাপূর্ণ এবং দোয়াগো ব্যক্তিত্ব আমাকে নিজ মেয়েদের চেয়েও বেশি ভালোবাসা দিয়েছে।

এরপর তিনি সর্বদা এই নসীহত করতেন যে, খেলাফতের সাথে কখনো সম্পর্ক ছিন্ন করবে না। আমার সাথে তার বিভিন্নভাবে আত্মীয়তা ছিল, কেননা তিনি অন্য মায়ের দিক থেকে আমার দাদীর বোনও ছিলেন, এ দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি আমার দাদীও ছিলেন আর খালাও ছিলেন আবার ফুপুও ছিলেন। এসব আত্মীয়তা সত্ত্বেও তিনি বলতেন, আমি শুধু যুগ-খলীফার অনুগত। এগুলো কেবল কথার কথা নয়, বরং সত্যিকার অর্থেই যুগ-খলীফার সাথে তার এই সম্পর্ককে তিনি বিশ্বস্ততার সাথে রক্ষা করেছেন। অজস্র দান-খয়রাত করতেন, তাহরীকে জাদীদের চাঁদা জামা'তের বিভিন্ন বুযুর্গ ও শিক্ষক, এমনকি কাদিয়ানের বিভিন্ন কর্মচারীর পক্ষ থেকেও নিজেই আদায় করতেন। যখন কোন কর্মচারীর বিদায় নিত, তখন তিনি কিছু-না-কিছু দিয়ে তাকে বিদায় দিতেন এবং এটিও বলতেন যে, যদি কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকে তাহলে ক্ষমা করে দিও। তার এক কন্যা শাহেদা বলেন, ছোট বয়সেই আমাদের মা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র সাথে পরিচিত করে দিয়েছেন। তিনি বলতেন, জুতার ফিতাও যদি চাইতে হয়, খোদা তা'লার কাছে চাও আর বেশি বেশি দোয়া কর। আর খিলাফতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার বিষয়ে তিনি অনেক নসীহত করতেন। খলীফা নির্বাচনের সময় এলে তিনি বলেছিলেন, যিনিই খলীফা নির্বাচিত হবেন তাঁর পূর্ণ আনুগত্য করতে হবে আর একথাও বলতেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সবুজ সতেজ শাখা হওয়ার জন্য দোয়া করবে, শুষ্ক শাখা হবে না আর কারো পদস্খলনের কারণ হবে না।

এরপর তার কন্যা নুসরত জাহান বলেন, আমাদের ছোট বয়স থেকেই তরবিয়তের বিষয়টি তিনি দৃষ্টিপটে রেখেছেন। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের সময় কোন আয়াতে থেমে গিয়ে আমাদেরকে সেই আয়াতের মর্ম বুঝাতেন বা অন্য কোন নসীহত করতেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি সর্বদা অতীত বুযুর্গদের স্মৃতিচারণ করতেন। অনেক অমূল্য ও শিক্ষণীয় ঘটনা তার জানা ছিল, যা তিনি অধিকাংশ সময়ই পুনরাবৃত্তি করতেন এবং আমাদেরকে শোনাতেন।

হযরত নবাব আমাতুল হাফীয সাহেবার কন্য লাহোর জেলার লাজনার সদর ফৌজিয়া শামীম সাহেবা বলেন, তিনি এক অসাধারণ নারী ছিলেন। যখনই তাকে চাঁদার জন্য বলা হতো তিনি আশ্বস্ত হলে মন খুলে চাঁদা দিতেন। তিনি কখনো মৌখিকভাবে আবার কখনো চিরকুটে লিখে চাঁদার ওয়াদা করতেন আর মোটা অংকের চাঁদা আদায় করতেন। তিনি চাঁদা আদায়ের পাশাপাশি একথাও বলতেন যে, এই চাঁদার কথা কোথাও যেন উল্লেখ না করা হয়। নিতান্তই সরল মহিলা ছিলেন। ব্যক্তিগত বিষয়াদিতে তিনি খুবই সাদাসিধে ছিলেন, এমনকি কিছু লোক তাকে কৃপণ মনে করতো, কিন্তু নিজে সাদাসিধে থাকলেও দান-খয়রাতের ক্ষেত্রে মুক্তহস্তে দান করতেন। তিনি বলেন, একবার আমি মসজিদের জন্য নিজ অঞ্চলে চাঁদার আহ্বান জানাই, এ বিষয়ের উল্লেখ করলে তিনি বৃহৎ অংকের টাকা, অর্থাৎ প্রায় এক কোটি রুপি চাঁদা হিসাবে আমাকে পাঠিয়ে দেন।

এরপর তার দৌহিত্রী রাযিয়া বলেন, শৈশব থেকেই তিনি অনেক ভালো ভালো কথা বলতেন এবং দিকনির্দেশনা দিতেন। ছোট বয়স থেকেই ভবিষ্যত সৌভাগ্যের জন্য দোয়া করার নসীহত করতেন। পুণ্যবান স্বামী লাভের জন্য দোয়া করার নসীহত করতেন। কম বয়সে লজ্জা পেলে বলতেন, আল্লাহ্ তা'লার কাছে বলতে লজ্জা পাওয়া উচিত নয়, তাঁর কাছে মন খুলে চাও। ধর্মীয় পুস্তকাদি নিয়মিত পড়তেন আর অধিকাংশ সময় সফরকালে দোয়া ও দোয়া সম্পর্কিত কবিতা পড়তেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন আর তার সন্তানদের ও পরবর্তী প্রজন্মকে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলার তৌফিক দান করুন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ কাজাকিস্তানের প্রাক্তন আমীর রোলান সাইন বাইফ সাহেবের স্ত্রী মোকাররমা ক্লারা আপা সাহেবার। তিনি গত মাসে মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। কাজাকিস্তানের মুবাল্লেগ আতাউর রব চিমা সাহেব লিখেন, ৯৪ বা ৯৫ সালের দিকে তিনি বয়আত করার তৌফিক লাভ করেন। তিনি কাজাকিস্তানের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্যা ছিলেন। তার স্বামী মোহতরম রোলান সাইন বাইফ সাহেব কাজাকিস্তানের প্রথম আমীর এবং রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টাও ছিলেন এবং কাযাখ ভাষার একজন প্রখ্যাত লেখকও ছিলেন। ক্লারা সাহেবা নিজেও বেশ ভালো অনুবাদক ও লেখিকা ছিলেন। কাজাকিস্তানে জামা'ত প্রতিষ্ঠার গৌরব ক্লারা সাহেবা ও তার স্বামী মোহতরম রোলান সাহেবেরই প্রাপ্য। মোহতরমা ক্লারা সাহেবা কাযাখ ভাষায় পবিত্র কুরআন অনুবাদও করেছেন যদিও সেটি প্রকাশিত হয় নি, তথাপি এর মাধ্যমে জামা'তের প্রতি তার ভালোবাসা স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠে যে, তিনি আকুল হয়ে কাজাকিস্তান জামা'তকে ফুলেফলে সুশোভিত দেখতে চাইতেন আর এর জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। স্থানীয় মোল্লারা বিরোধিতার ক্ষেত্রে এই পরিবারের কথা উল্লেখ করার সময় এ কথা অবশ্যই বলে যে, এরা আহমদী আর এরাই কাজাকিস্তানে আহমদীয়াত নিয়ে এসেছে। মরহুমা ক্লারা সাহেবার মেয়ে মারবা সাসিন বাইবা লিখেন, আমার মা খুব ভালো অনুবাদক ছিলেন। বহুমুখী ও দৃঢ় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি খুবই পরিষ্কার ও উজ্জল ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। ৯৫ সালে লন্ডনে স্থাপিত কাজাকিস্তানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র 'হাউস অফ আবায়ী' এর একজন প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। লন্ডনে বসেই তিনি তার পুস্তক 'কাজাকিস্তান' লিখেছিলেন আর সে সময়ই তিনি জামা'তের সাথে পরিচিত হন। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর হাতে বয়আত করার তৌফিক পেয়েছেন। তিনি বলেন, তিনি শুধু তার সন্তানদেরই মা ছিলেন না বরং তাদের জন্যও মাতৃতুল্য ছিলেন যারা তার কাছে সাহায্য ও পরামর্শের জন্য আসতো।

নুরেম তাইবেক সাহেব বলেন, জামা'তের সকল যুবক আহমদীর জন্য এবং সার্বিকভাবে পুরো জামাতে আহমদীয়া কাজাকিস্তানের জন্য তিনি একজন মায়ের ভূমিকা পালন করতেন। তিনি আরো বলেন, আমি দশ বছর ক্লারা সাহেবার সেই যুগ দেখেছি যার প্রাথমিক তিন বছর অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে আর কখনো কখনো এক পাহাড়ের মতো দণ্ডায়মান

থেকে তিনি জামা'তের সুরক্ষায় ও জামা'তের সেবায় লেগে থাকতেন। বয়স, অসুস্থতা, অন্যান্য বিষয়াদি ও পুস্তকাদি প্রণয়ন ইত্যাদি কারণে পরবর্তীতে তিনি অনেক ব্যস্ত হয়ে পড়েন, কিন্তু আন্তরিকভাবে সর্বদা জামা'তের কাজে আত্মনিয়োগ এবং খিলাফত ও জামা'তের সাথে সর্বদা নিষ্ঠার সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টায় থাকতেন।

অতঃপর বলেন, রোলান সাহেব ও ক্লারা সাহেবাকে কাজাকিস্তানে দীর্ঘসময় ধরে দেশপ্রেম ও জাতির উন্নতির প্রতীক বলে মনে করা হতো। রোলান সাহেবের সফলতার বড় অংশ ক্লারা সাহেবার কাছে ঋণী। তিনি লাজনা ইমাইল্লাহ্ কাজাকিস্তানের একজন সক্রিয় সদরই ছিলেন না, বরং জামা'ত আহমদীয়া কাজাকিস্তানের প্রথম আমীরের একজন শিক্ষিকাও ছিলেন বটে। তিনি বলেন,আমার মনে আছে ৯৬ থেকে ৯৯ সাল পর্যন্ত অথবা এর পরেও তিনি খুবই চমৎকারভাবে জামা'তের মিশন হাউসে লাজনাদের সাপ্তাহিক ক্লাসে সুচারুরূপে লাজনাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতেন। লাজনারা মুরব্বী সাহেবের কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন করত আর তাদেরকে সেসব প্রশ্নের উত্তর দেয়া হতো। এরপর তিনি বলেন, জামা'তে আহমদীয়ার পুস্তকাদির অনুবাদ ক্লারা সাহেবার চেয়ে ভালো আর কেউ করতে পারত না। ক্লারা সাহেবা সকল বুযুর্গ আহমদীর মধ্যে সর্বোত্তম আহমদী ছিলেন যে কারণে তিনি জামা'তের যুবক বয়সের আহমদীদের জন্য আধ্যাত্মিক তরবিয়তের এক মাধ্যম ছিলেন। তার মাঝে জামা'তী মূল্যবোধ তথা প্রকৃত ইসলামের প্রেরণা ছিল। বিপদের সময়ও তিনি কখনো মনোবল হারাতেন না, বরং সবসময় নিজে এবং অন্যদেরও বিজয়ের দিকে নিয়ে যেতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন এবং কাজাকিস্তানে আহমদীয়াত প্রসারের ক্ষেত্রে তার যে প্রচেষ্টা ছিল তা সফল করুন, তার দোয়াসমূহ গ্রহণ করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ উইং কমান্ডার আব্দুর রশিদ সাহেবের, যিনি গত মাসে মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি মূসী ছিলেন। তার ছেলে ফারুক বলেন, তার পিতার নাম বাবু শেখ আব্দুল আযিয, যিনি মজলিস কারপরদাযের সেক্রেটারী ছিলেন এবং তার জেঠা ছিলেন খান সাহেব ফারযান্দ আলী খান সাহেব, যাকে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) জামা'তের ইতিহাসে লাহোরের প্রথম আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। তার পিতা যুবক বয়সে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, রশিদ সাহেব তার পিতামাতার একমাত্র সন্তান ছিলেন। রশিদ সাহেবের পিতার আহমদীয়াত গ্রহণের কারণে প্রথম স্ত্রী, দুই কন্যা সন্তানকে রেখে চলে যায়। এরপর তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেন এবং সেই ঘরে রশিদ সাহেবের জন্ম হয়। তিনি বলেন, পিতামাতার খুবই আজ্ঞানুবর্তী ছিলেন, তাদের সেবা করতেন, আনুগত্যের সাথে তাদের সব কথা মান্য করতেন। পাকভারত বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত পিতা কাদিয়ানেই শিক্ষা অর্জন করেন। এরপর বলেন, দেশবিভাগের সময় তিনিও অন্যান্য কাফেলার সাথে কাদিয়ান থেকে লাহোরে পৌঁছেন এবং প্রথম দিকের কয়েকটি পরিবারের সাথে পিতামাতাসহ রাবওয়াতে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। ৫৪ সালের দিকে তিনি এয়ার ফোর্সে কমিশন নেন এবং বিভিন্ন এয়ার বেইসে নিযুক্ত থাকেন। তিনি যেখানেই ছিলেন আহমদীয়াতের প্রচার করতেন। তাকে পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে লিবিয়াতে কিছু সময়ের জন্য ডেপুটেশনে পাঠানো হয়েছিল, যদিও তার ফাইলে লিখা ছিল তিনি কাদিয়ানী, যেতে পারবেন না, কিন্তু তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা তা সত্ত্বেও তাকে প্রেরণ করেন, কেননা তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, তোমার মতো এমন অফিসার আমি আর কাউকে দেখছি না। তিনি বলেন, আমার পিতা বলতেন, একবার লিবিয়াতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতের সাথে সাক্ষাৎ ছিল। তিনি যখন রাষ্ট্রদূতের অফিসে প্রবেশ করেন তখন তিনি দেখেন যে, রাষ্ট্রদূতের একপাশে আরবী ভাষায় জামা'তের বিরোধিতামূলক বইপুস্তক ও লিফলেট রাখা আছে। অতএব রশিদ সাহেব অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে রাষ্ট্রদূতকে জিজ্ঞেস করেন, এগুলো কী আর কেন রেখেছেন? তিনি

উত্তরে বলেন, এসব কিছু বৃথা ও অনর্থক, চিন্তা করবেন না। তিনি বলেন, জিয়াউল হকের সরকারের পক্ষ থেকে ছাপিয়ে আমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে যেন আমরা এই দেশে তা বিতরণ করি এবং সকল আরব দূতাবাসে এটি পাঠানো হয়েছে। এরপর তিনি বলেন, ১৯৮২ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) যখন স্পেনে গিয়েছিলেন তখন সেখানেই তার একটি রিপোর্টের ভিত্তিতে খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) তাকে লিবিয়ার আমীর নিযুক্ত করেন এবং তিনি (রাহে.) নিজ হাতে লিখে তাকে নিযুক্তি দেন। তিনি লিবিয়া জামা'তের প্রথম আমীর ছিলেন। নামাযের কথা বলার প্রয়োজন নেই, কেননা একজন মু'মিনের জন্য তা এমনিতেই আবশ্যক, তিনি নামাযে নিয়মিত ছিলেন, সেই সাথে কুরআন তিলাওয়াত ও চাঁদা প্রদানের ক্ষেত্রেও তিনি খুবই সময়নিষ্ঠ ছিলেন। তিনি তার মৃত্যুর পূর্বে তার হিস্যায়ে আমদ পরিশোধ করেছিলেন। ওয়াকফে জাদীদ ও তাহরীকে জাদীদের চাঁদা নিজের পক্ষ থেকে এবং বুযুর্গদের পক্ষ থেকে আদায় করতেন। তিনি বলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর একটি ঘটনা তিনি তার ছেলেকে শুনিয়েছেন। তার ছেলে লিখেন, রাবওয়ার প্রাথমিক দিনগুলোতে কোন এক সময় হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) তাকে ডেকে পাঠান তখন গরমকাল ছিল। তিনি বলেন, আব্বাজান যখন কক্ষে প্রবেশ করেন তখন হুযূর চাটাইয়ের ওপর শুয়ে ছিলেন আর তিনি যখন চাটাই থেকে উঠেন তখন হুযূরের দেহে চাটাই-এর দাগ দেখা যাচ্ছিল। তিনি বলেন, এসব কারণে আমাদের মতো শিশুদের হৃদয়েও খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা এবং আনুগত্যের একটি গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠে আর এর অনেক প্রভাবও আমাদের ওপর পড়ে।

১৯৮৪ সালে বিমান বাহিনীর স্কোয়াড্রন লিডার র‍্যাংক থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন, অতঃপর রাবওয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। এরপর সদর উমুমী এবং বিচার বিভাগে কিছুদিন কাজ করেছেন। দরিদ্রদের লালনকারী এবং সবার অভাবের খোঁজখবর নিতেন। তিনি আরও বলেন, বিদায় লগ্নে তার শেষ ওসীয়্যতও এটিই ছিল যে, দরিদ্রদের খেয়াল রাখবে। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি দয়া ও ক্ষমার আচরণ করুন আর সন্তানদেরও তার পুণ্যসমূহ অব্যাহত রাখার তৌফিক দিন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ আমেরিকা নিবাসী জনাব করীম আহমদ নাঈম সাহেবের সহধর্মিণী মোহতরমা জুবায়দা বেগম সাহেবার। তার মৃত্যুও গত মাসে হয়েছে, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি হযরত ডাক্তার হাশমত উল্লাহ্ খান সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্রবধূ ছিলেন। মরহুমা খিলাফতের প্রতি নিবেদিত, পুণ্যবতী এবং নিষ্ঠাবান মহিলা ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ওসীয়্যত করেছিলেন। মৃত্যুকালে তিন পুত্র ও দুই কন্যা রেখে গেছেন। তার এক পুত্র মুনিম নাঈম সাহেব হিউম্যানিটি ফার্স্ট যুক্তরাষ্ট্র-এর চেয়ারম্যান। আর তিনি ছিলেন শহীদ ডাক্তার আব্দুল মান্নান সিদ্দিকী সাহেবের শাশুড়ি। তার কন্যা আমাতুস শাফি, অর্থাৎ ডাক্তার মান্নান সিদ্দিকী সাহেবের সহধর্মিণী লিখেন, সবার সাথে ভালোবাসাপূর্ণ ব্যবহার করা তার রীতি ছিল এবং সবার জন্য দোয়া করতেন, বিভিন্ন সুপরামর্শ দিতেন, দরিদ্রদের সাহায্য করতেন। কাছের এবং দূরের সকল আত্মীয়স্বজনের সাথে ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। যৌবনকাল থেকেই নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়তেন। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভরসা রেখে নিজের জীবন কাটিয়েছেন। আমাদের শৈশব থেকেই আমরা তাকে জুমুআর দিন বিশেষ ইবাদত করে কাটাতে দেখেছি। সময়মতো নিজের চাঁদা আদায় করার বিষয়ে তিনি সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন এবং তার সন্তানদেরও পুণ্যকর্ম করার সৌভাগ্য দিন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হাফীয আহমদ ঘুমান সাহেবের, যিনি কিছুদিন পূর্বে পরলোক গমন করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। পবিত্র কুরআনের অর্থ ও তফসীর অধ্যয়ন করার তার বিশেষ

আগ্রহ ছিল। একইভাবে তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সব বই পড়েছিলেন। রাবওয়াতে জামা'তের কাজ করারও সুযোগ লাভ করেছেন। তিনি খুবই সময়ানুবর্তী, অতিথিপরায়ণ, শিশুদের প্রতি স্নেহশীল, খুবই সরল প্রকৃতির অধিকারী ও কঠোর পরিশ্রমী একজন মানুষ ছিলেন। সর্বদা যিকরে ইলাহীতে রত থাকতেন। মানুষের প্রতি সহানুভূতি তার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল, নিজেকে কষ্টের মাঝে ফেলে হলেও অন্যদের প্রশান্তির ব্যবস্থা করতেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মরহুম মূসী ছিলেন। তিনি তার অবর্তমানে তিন পুত্র ও তিন কন্যা রেখে গেছেন। তার এক জামাতা কাশেফ হামীদ বাজওয়া সাহেব এখানে আমাদের পি.এস. দপ্তরে মুরব্বী হিসেবে কর্মরত আছেন। তার কন্যা আমতুল কুদ্দূস বলেন, বিনয় ও নম্রতা তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রোথিত ছিল। তার পোশাক, ঘরবাড়ি, পানাহার একেবারেই সাদামাটা ছিল। সর্বদা অহংকার বর্জন করে চলতেন। দরিদ্রদের প্রতি সর্বদাই যত্নবান ছিলেন। প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও নিজের জন্য কম খরচ করতেন এবং দরিদ্রদের জন্য বেশি খরচ করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথেও ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন এবং তার সন্তানদেরও তার পুণ্যকর্মসমূহ অব্যাহত রাখার তৌফিক দিন। (আমীন)

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)